প্রতিশ্রুত দেশ

হেনরিক্ পন্টোপিডান

ভাষান্তর

সুজাতা পান্থী সরকার

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

হেনরিক্ পন্টোপিডান

১৯১৭ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তৃতীয় বছরে পড়েছে। এই যুদ্ধেরই কারণে সে বছর নোবেল পুরস্কারকে কেন্দ্র করে কোনও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হল না। আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ্মভাবে পুরস্কৃত হলেন ডেনমার্কের দু'জন কৃতি লেখক। কার্ল গিয়েল্লেরুপ ও হেনরিক্ পন্টোপিডান।

১৮৫৭ সালের ২৪ জুলাই ডেনমার্কের ফ্রেদেরিসিয়া নামে এক ছোটো শহরে জন্মগ্রহণ করেন হেনরিক্ পন্টোপিডান। তাঁর পিতা ডীনেস পন্টোপিডান ছিলেন একজন মন্ত্রী। আর পিতামহ ধর্মযাজক। তাঁর ছয় বছর বয়সে, পিতার সঙ্গে তাঁর পরিবার চলে আসে রান্ডারসে। ষোলোজন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তাঁর স্মৃতিচারণায় জানা যায়— তাঁর জীবনে বাবার থেকে সম্ভবত মা'র প্রভাবই বেশি। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকলেও, কৃষ্টিশীল এই মহিলা নিয়মিত পাঠ করতেন ইতিহাস ও অর্থনীতি। সেই তুলনায় বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শীতল দূরত্বের।

১৮৭৩ সালে তাঁকে পাঠান হল কোপেনহেগেনে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কিন্তু সেখানে তাঁর আকর্ষণের প্রধান বিষয় হয়ে উঠল— কোপেনহেগেনের নানা গ্যালারি, মিউজিয়াম বা রয়েল চ্যাপেল। ভালোবাসতেন নানা বক্তাদের বক্তৃতা শুনতে। ড্যানিশ নাট্যকার, সমালোচক জর্জ ব্রান্ডস্ হয়ে ওঠেন তাঁর অনুপ্রেরণা। তাই এর মাত্র চার বছর পরই স্থির হয়ে যায় তাঁর জীবনের লক্ষ্য— সাহিত্য সাধনা।

ফলে কারিগরী শিক্ষায় ইতি টেনে তিনি বেরিয়ে পড়েন পৃথিবীকে চিনতে। প্রকৃতিকে জানতে। কিছুদিন সুইট্জারল্যান্ডে নিসর্গকে উপভোগ করে ফিরে আসেন ডেনমার্কে। হেডমাস্টার ভাই মরটেনের স্কুলে শুরু করেন বিজ্ঞান পড়াতে। রাজনৈতিক কারণে মরটেন জেলে গেলে, স্কুলের সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। বেকার হয়ে যান হেনরিক্। সেই সময় থেকেই পাকাপাকিভাবে শুরু হয় তাঁর লেখক জীবন। তাঁর কথায়— 'নো রিসক্ নো গেন।' তাঁকে আকৃষ্ট করে কৃষকদের জীবনযাত্রা। বিয়ে করেন এক কৃষকের মেয়েকে।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম পুস্তক— 'স্টেক্কেডে ভিঙ্গের' (ক্লিপড্ উইঙ্গস্)। এটি একটি ছোটো গল্প সংকলন। ১৯০০ সালে তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতা। সঙ্গে অব্যাহত থাকে সাহিত্য প্রয়াস।

১৮৯২-তে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর তিনি বসবাস শুরু করেন কোপেনহেগেনের কাছে শার্লটেনলুন্ড নামে শহরে। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হল তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'দেত্ ফোরএইতেদে লান্দ' (দি প্রমিস্ড ল্যান্ড)। এখানে নিবিড়ভাবে

চিত্রিত হয়েছে ডেনমার্কের গ্রাম্যজীবন, তাদের মানসিকতা, ধর্মীয় মত, রাজনৈতিক চিন্তা ও পরিবেশ।

পন্টোপিডানের দ্বিতীয় উপন্যাস 'লাকি পিটার' লিখিত হয়— ১৮৯৮ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে। অন্যান্য উপন্যাসগুলি— 'নাত্তেভাগত্' (১৮৯৪), 'দেন গামলে আদাম' (১৮৯৫) এবং 'হ্যোসাঙ্গ' (১৮৯৬) ডেনমার্কের কৃষ্টি, ভাব-ভাবনা ও নৈতিক বিষয়ের চর্চায় সমৃদ্ধ।

১৯১২ থেকে ১৯১৬-র মধ্যে রচিত গ্রন্থ 'দে দ্যোদেস রিগস্' (কিংডম অফ্ দ্য ডেড) -এ বিংশ শতকের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা ও গণনৈরাশ্যের বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। এই উপন্যাসটি লেখবার সময় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন লেখক। প্রায়ই তাঁর মনে হচ্ছিল— মৃত্যু দূরে নয়। আচ্ছন্নের মতো উপন্যাসটি লিখতে লিখতে বারবার বলেছেন— 'আমি লেখক নই.... একজন বিশ্বস্ত অনুগত যোদ্ধা।' এই রচনায় তাঁর এই ভাবটিই প্রতিফলিত।

হেনরিক্ পন্টোপিডানের শেষ উপন্যাস— 'মান্দস্ হিমরিগ্' (ম্যানস্ হেভেন, ১৯২৭) -এ কশাঘাত করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানে বস্তুতান্ত্রিক মনোবৃত্তিকে।

তাঁর সর্বশেষ রচনাটি স্মৃতিচারণামূলক। যেটি চার খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩-এ চার খণ্ডের এই স্মৃতিচারণ একত্রে পুনঃপ্রকাশিত হয় 'উন্দের ভেইয়েস্ তিল মিগ্ সেলফ্' নামে।

১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে অরদ্রুপ-এ ৬৪ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় এই নোবেল জয়ী লেখকের।

প্রথম পরিচ্ছদ

॥ এক ॥

ভেইলবির উত্তরে বড়সড় জমিটায় হালচাষ করছিল একটা লোক...

লোকটা বেশ লম্বা। দূর থেকে বুড়োটে লাগলেও—জোয়ানই। পরনে তালিমারা মোটা কাপড়ের আলখাল্লা। হাতে লাল দস্তানা আর পায়ে জবরজং ওয়েলিংটন বুটজুতো। জুতোর ফিতেগুলো আবার প্যান্টের ওপর দিয়ে হাঁটু অবধি পেঁচিয়ে বাঁধা। মাথায় চুলঢাকা পশমের টুপি—রোদবৃষ্টিতে পোড় খেয়ে চুলগুলো সাদাটে হয়ে গুটিয়ে গেছে। লম্বা হালকা দাড়িটা লুটোপুটি খেতে খেতে উড়ে যাচ্ছিল কাঁধ পর্যন্ত। মুখটা রোগাটে। টিপির মতো ফুলো কপাল। তবে চোখ দুটো বেশ নম্র আর টানা টানা।

তার মাথার কাছে এক ঝাঁক রোস্টন কাক কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। আবার থেকে থেকে কাকগুলো প্রথমে একটা— তার পিছনে আর একটা—পাক খেতে খেতে এসে বসছে সদ্য হালচষা জমিটার ওপর। শ্রান্ত, ক্লান্ত, জীর্ণ ঘোড়াটাকে আরও তাড়াতাড়ি চলবার জন্য যখন ঝাঁকানি দিচ্ছে লোকটা— কেবল তখনই কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে একটু সরে সরে যাচ্ছে।

লোকটা ভেইলবি আর স্কিবারআপ যাজকপল্লির প্রধান যাজক ইম্যানুয়েল। যাজকপল্লির সবাই বা পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে এই নামেই ডাকে। কেননা এটাই তার পছন্দ। তবে বন্ধুস্থানীয় যারা তারা তাকে বলে, 'ঈশ্বরের আধুনিক দূত'। অবশ্য যারা তাকে ঈর্ষা করে, ব্যঙ্গ করে তারাও এই নামেই অভিহিত করে। যদিও আড়ালে...

তার পোশাক বা এলোমোলো চুলদাড়ি সত্ত্বেও তাকে ঠিক চাষি বলে মনে হয় না। চেহারাটা সুঠামই বলা চলে। শুধু কাঁধটা একটু সামনের দিকে ঝোলা। হাতের তালু লালচে আর ছড়ানো হলেও— বেখাপ্পা নয়। হাতে হাত মেলালে বোঝা যায়, জন্ম থেকে যারা কাজ করতে অভ্যস্ত, এ হাত তাদের চেয়ে আলাদা। বরাবরের মজুরের মতো কাঠখোট্টা নয়। মুখটা ঠিক চাষিদের মতো অত কালো না হলেও এখন রোদ পোড়া ঝামার মতো। ছোটো ছোটো বাদামি বিন্দুতে ভরা।

মার্চের শুরুতে শীতের এই সকালটা বড়ো বেশি ঠান্ডা। কনকনে। পশ্চিমি ঝোড়ো হাওয়ার দাপাদাপিতে সমতলে নেমে এসেছে কুয়াশা—। মাঠগুলো এমন ভাবে ঢেকে গেছে কুয়াশার হালকা পরতে তফাত বোঝা যাচ্ছে না—মাঠের শেষ বা শুরু কোথায়। আবার কখনও বা এক ঝলক হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে মাঝমাঠের কুয়াশা। সেখানে তখন সবুজ মাঠ বা চষা খেত। তার গায়ে ভিজে ছাইছাই একটা আস্তরণ। এরই মধ্যে থেকে

থেকে ঘন জমাট মেঘের শীতলতা ভেঙে উঁকি দিচ্ছে স্তিমিত রোদের ঝিলিক। মাঠেএসে পড়ছে সূর্যরশ্মি। কুয়াশা ভেদ করে কখনও বা পৌঁছে যাচ্ছে মাটির বুকে।

এই সময় যাজকপল্লির মাঠগুলোর ওপরের দিকটায় কেউ যদি দাঁড়ায়—ছবির মতো সে দেখতে পাবে নীচে যাজকপল্লির গির্জার মাথায় কুয়াশার আবছায়া। পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের ফেনার মতো নানা গাছ। ছোটো ছোটো ফুটকি যেন—গুপ্ত গর্ত। শান্ত খাঁড়িটার পশ্চিমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্কিবারআপের তিনটে আদিম পাহাড়। আর সেই পাহাড়গুলোর পায়ের কাছেই স্কিবারআপের সদ্য তৈরি হওয়া লাল মাথাওয়ালা সভাঘরটা। এবং তার পাশে কতকগুলো পাতা-ছাওয়া কুঁড়ে।

আকাশের রং বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। সেই সঙ্গে নতুন রূপ নিচ্ছে প্রকৃতি প্রায় প্রতি মুহূর্তে। রোদ আর কুয়াশার এই খেলা—লুকোচুরি, চলছে অনেকক্ষণ ধরেই। কেউ দেখুক বা না দেখুক। চলছেই অবিরত।

ইম্যানুয়েল এমনই মগ্ন ছিল চিন্তায়—প্রকৃতির এই রংবদল তার চোখেই পড়েনি। এমনকী ক্লান্ত ঘোড়াদের দম নেবার জন্য যখন সে দাঁড়াল। তখনও তার দৃষ্টি সামনের চষা জমিটার আনাচে কানাচে। তবুও সে একবারও তাকাল না আকাশের দিকে। গত সাত বছর ধরে এই তরঙ্গায়িত পাহাড়গুলো একইভাবে পড়ে রয়েছে অনড় হয়ে। এদের দেখতে দেখতে তার চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজ সূর্যের আলো কখন জায়গা ছেড়ে দিল বৃষ্টিকে। সে টেরও পেল না। তার চমক ভাঙল গলার স্বরে। ছোটো একটা দল মেঠো পথ ধরে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

প্রথমে গাট্টাগোট্টা ছোট্ট এক মেয়ে। বছর চার কী পাঁচ হবে। তার কাঁধের ওপরে একটা দড়ি। দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা পুরনো একটা বাক্স গাড়ি। সেটাতে বসে আছে একটি শিশু। কাদার মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে মেয়েটি টেনে নিয়ে আসছে গাড়িটা। চলার টানে মাথার টুপিটা খুলে গিয়ে, হাওয়ায় উড়ছে তার হলুদ চুলগুলো। প্রতি মুহূর্তে পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে তার ঢিলে হয়ে যাওয়া লাল মোজাটা পড়ে যাচ্ছে কাঠের জুতোর ওপরে। সে আবার তাকে টেনে তুলছে যথাস্থানে। পিছন থেকে গাড়িটা ঠেলছে আর একজন—একটি ছেলে। তার মাথায় হাতেবোনা টুপি। শক্ত করে কান ঢেকে ঘুরিয়ে চিবুকের নীচে বাঁধা। একটা কানের ওপর দিকটা ফোলা। বোঝা যাচ্ছে—সেখানে বড়সড় পট্টি বা কাপড় ঢোকানো। সেইদিককার গালের প্রায় অর্ধেকটাই ঢেকে আছে টুপিতে।

আর একজন সোজা, সবল কৃষক তরুণী সবার পিছনে। রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে সে আসছে অন্যদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে। তার মাথাটা ঢাকা একটা ছোটো ফুল ফুল শালে। শালের কোণাটা বারবার উড়ে যাচ্ছে দমকা বাতাসে। বাদামি ব্যস্ত হাতদুটো দিয়ে সে বুনে চলেছে কোনও নকশা। চোখদুটো তাতেই নিবদ্ধ। রাস্তার দিকে না তাকিয়ে—কখনও গুনগুন করে বা কখনও জোরে কোনও সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে পথ চলেছে।

এই হচ্ছে হ্যানসিন এবং তার তিন ছেলেমেয়ে—ইম্যানুয়েলের পুরো পরিবার।

ছোট্ট গাড়িটা প্রায় গিয়ে পৌঁছল, ইম্যানুয়েল মাঠের শেষ প্রান্তে যেখানে চাষ করছিল—তার কাছাকাছি। বাচ্চারা গাড়িটা ছেড়ে দিয়েই বসে পড়েছে পথের ধারে একটা ভাঙা পাথরের ওপর। সেখান থেকে বাবাকে তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাঠের অন্য দিকটায়। তাদের মুখগুলো ঠান্ডায় নীল। নাক থেকে জল গড়াচ্ছে। তালি দেওয়া জামা আর পুরনো কাঠের জুতো পরা পায়ে — গ্রামের অন্য যে কোনও রাস্তার বাচ্চাদের থেকে আলাদা কিছু নয়। এই অবস্থায় তাদের দেখে কেউ বলবে না যে তারা প্রাসাদের মতো বিশাল যাজকনিবাসের বাসিন্দা। ওখানেই তারা থাকে। যার উঁচু লাল ছাদ আর আকাশ-ছোঁয়া পপলার গাছগুলোর মাথা চাষিদের ধূসর রঙা খামারের ওপরে সর্বদাই জেগে থাকে মাথা উঁচু করে।

দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়েছে ইম্যানুয়েল। টুপি ওড়াচ্ছে খুশিতে।

একটু পরেই লাঙল চষা জমিটার পাশে সরু আলপথের শেষ প্রান্তে এসে হাঁক পাড়ল সে,

'নতুন কোনও খবর... হ্যানসিন?'

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ছোট্ট গাড়িটা নাড়াচ্ছিল হ্যানসিন। কেননা গাড়ি থামালেই অধৈর্য হয়ে উঠছে ভেতরের ছোট্ট মানুষটা।

সেলাইয়ের ঘর গুনতে গুনতে চোখ না তুলেই উত্তর দিল সে,

'না। তেমন কিছু নয়... ওহো! তাঁতি এসে একবার ঘুরে গেছে। তোমার সাথে কথা বলতে চাইছিল।' হ্যানসিনের বাচনভঙ্গি একেবারে নির্ভেজাল গ্রাম্য চাষিদের মতো।

'সত্যি!...' এতক্ষণ মাঠে কতটা কাজ হয়েছে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক ভাবে বলল ইম্যানুয়েল, 'ওর মনে যে কী আছে ভগবান জানেন!'

'না। বেশি কিছু বলেনি। কেবল তোমাকে জানাতে বলেছে—বেলা তিনটের সময় যাজক পরিষদের সভা আছে।'

'হয় দুঃস্থ ত্রাণ। নইলে যাজকপল্লির কোনও ব্যাপারে... তোমাকে ঠিক করে কিছু বলেনি?'

'না। বেশি কথা বলেনি। সামনের দিকে তাকিয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেল।'

'সত্যি। লোকটা ভারী অদ্ভুত...।' কথার মধ্যিখানেই হঠাৎ থেমে গেল ইম্যানুয়েল। গলার স্বরটাও বদলে গেল যেন। তারপরেই প্রসঙ্গ বদলে আত্মমগ্ন হয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল আবার :

'তোমার মনে আছে, হ্যানসিন... একটা নতুন ধরনের সারের কথা বলেছিলাম। ওই যে একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম...। যতই ভাবছি ব্যাপারটা। ততই ভাল লাগছে। এটা অনেক বেশি প্রাকৃতিক। চাষ করবার আগে মাঠে ছড়িয়ে দাও। তারপর লাঙল টান। পাহাড় করে জমিয়ে রাখতে হয় না। ফলে বাতাস দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে ওঠবারও কোনও

সম্ভাবনা নেই।... তোমার মনে পড়ছে, আরও কী লেখা ছিল পত্রিকাটায়? পুরনো নিয়মে চাষ করবার জন্য প্রতিবছর মাটির কত উর্বরতা নষ্ট হয়— প্রায় তিরিশ লক্ষ...। কেন যে আগে কেউ এত সহজ পদ্ধতির কথা ভাবেনি— অবাক লাগছে ভেবে।

আমার ধারণা, এগুলো জমিয়ে রাখা গ্রামের লোকের অভ্যাস। অবশ্য বেচারারা করবেই বা কী। দিনের পর দিন কেটে যায় মনিবের জমি চাষ করতে করতে... তার ফাই ফরমায়েশ খাটতে খাটতে। ফাঁকে সময় পেলে তবে না নিজেদের কথা ভাববে। তাই আর্বজনা ডাঁই করে রাখা ছাড়া উপায়ই বা কী !... আসলে কী জান? ওই জমিয়ে রাখা নোংরার স্তূপ। তার বোঁটকা গন্ধ— এসবই সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের ধ্বংসাবশেষ। অনেক পচাগলা জিনিসের মতোই আমরা চেষ্টা করছি তাদের ফেলে দিতে। ঝেড়ে ফেলতে।

ওহ্! হ্যানসিন... কী চমৎকার সময়ে যে বাস করছি আমরা! বলতে পার এটা একটা সন্ধিক্ষণ।... পুরনো সংস্কারগুলো ভেঙে গিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখছে মানুষ... জ্ঞানের আলোয় তাদের মনে জেগে উঠছে সত্য ও ন্যায় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। ছোটো বড় সব ক্ষেত্রে মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে দাসত্বের বিরুদ্ধে। মনে মনে সকলেই প্রস্তুত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য।'

সেলাই করতে করতেই একটু হেসে সায় দিল হ্যানসিন। খুব ভাল করেই সে জানে—এসব কথাতে কত সহজেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইম্যানুয়েল। নতুন দিনের নতুন ভাবনার ব্যাপারে তার আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত নেই। এ জাতীয় প্রত্যাশার কথা চুপচাপ শুনে যায় সে।

'এবার ঘোড়াগুলোকে ছুটি দেওয়া যেতে পারে।' একটা বড়ো রুপোর পকেট ঘড়ি বের করে ঠিক চাষিদের মতোই কানের কাছে ধরে সে বলল।

'ল্যাডি, এদিকে এসে বাবাকে কি একটু সাহায্য করতে পার, সোনা?'

ছেলেটি তখনও বসে আছে পাথরটার ওপর। বোনের পাশে। তার ভাসা ভাসা স্বপ্নালু চোখদুটো মেলে দেখছে—সদ্য হাল চাষ করা জমিতে কেমন নিঃশব্দে কাকগুলো হঠে যাচ্ছে ঝুরো ঝুরো মাটিতে পা ফেলে। হালকা চালে। দুলে দুলে। বাবার ডাক কানে যায়নি। একটা হাত পট্টি বাঁধা কানের ওপর রেখে সে বসে আছে নিঝুম হয়ে।... পুরনো ব্যথার কথা যখন মনে পড়ে যায়। কী গম্ভীর, থমথমে হয়ে ওঠে যে ছোটোদের মুখগুলো...।

বয়সের তুলনায় তাকে ছোটোই দেখায়। যদিও বোনের থেকে মাত্র সে এক বছরের বড়। বড়সড় চেহারা, লাল ফোলা ফোলা গাল ও গ্রাম্য বালিকাদের মতোই স্পষ্ট দুটো চোখে বোনকেই তার দিদি বলে মনে হয়।

ছেলেটি একেবারে হুবহু ইম্যানুয়েল। একইরকম চওড়া, উঁচু, বুদ্ধিদীপ্ত কপাল। একই রকম ভদ্র আচরণ—ঢেউখেলানো নরম বাদামি চুল—বড় বড় বাদামি চোখ। সূর্যের আলোয় কখনও কখনও একেবারে বর্ণহীন।

'সোনা, বাবা তোমাকে ডাকছে... শুনতে পাওনি?'... তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে হ্যানসিন জিজ্ঞেস করল।

মা'র ডাকে খুব চেষ্টা করে মুখে হাসি এনে ফিরে তাকাল সে।

'আবার কানে ব্যথা করছে, সোনা?' সতর্ক হয়ে জানতে চাইল হ্যানসিন।

'না... না। এখন আর কিছু হচ্ছে না।

'তাহলে... আসছ তো, ল্যাডি?' মাঠ থেকে আবার ডাকল ইম্যানুয়েল।

আর ঠিক তখনই একটা শকুন উড়ে এসে বসল লাঙল চষা জমির হলরেখার ওপর। মাপা পায়ে, হিসেব কষে এগিয়ে যেতে লাগল ঘোড়াগুলোর দিকে—ধীর-স্থির, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ছোট্ট গাড়োয়ানের মতো।

ছেলেটি ইম্যানুয়েলের চোখের মণি। গ্রামের গর্ব। এর কারণ অবশ্য—কিছুটা তার অকৃষকসুলভ চেহারা। আর কিছুটা তার শান্ত মেজাজ। দিও হ্যানসিনের বাবার নামেই তার নাম—অ্যানডারস্ ইয়র্গেন। তবু বাড়িতে বা গ্রামের সবাই তাকে ডাকে — 'ল্যাডি' বলে। জন্মের সময় এই নামটিই ইম্যানুয়েল দিয়েছিল। সবারই এত পছন্দ এই ডাকটা যে তার আসল নামটা প্রায় ভুলেই গেছে সকলে।

ল্যাডির দিকে এতক্ষণ ভাল করে নজর করেনি ইম্যানুয়েল। তার কানের পট্টিটা দেখে অবাক হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার! তোমার কানটা কি আবার খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ... একটু...।'

লজ্জা পেয়ে গেল বেচারা।

'ওই কানটা খুব ঝামেলা পাকাচ্ছে বারবার, তাই না?... তবে এখন বোধহয় বেশি কিছু হয়নি...?'

'না। না। একদম সেরে গেছে। একটুও ব্যথা করছে না আর।'

'এইতো আমার সাহসি ছেলের মতো কথা। ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না একটুও। দুর্বলতার মতো খারাপ জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই... জানো তো?'

'হ্যাঁ।'

'মনে আছে তো আজ বিকেলে আমরা দু'জন গাড়ি করে কারখানায় যাব। অতএব আমাদের অসুস্থ হবার কোনও সময় নেই।'

হ্যানসিনের হাত চলছিল খুব দ্রুত। সেলাই থেকে মুখ না তুললেও সব কথাই কানে যাচ্ছিল তার। তাদের কথা শেষ হলে সে বলল,

'ইম্যানুয়েল, আমার মনে হয় আজ আর ল্যাডির বাইরে গিয়ে কাজ নেই। সকাল থেকেই ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।'

'কিন্তু প্রিয়তমা... শুনলে না এক্ষুনি সব সেরে গেছে। আমি নিশ্চিত— তাজা হাওয়ায় ওই উপকারই হবে। পুরনো প্রবাদ আছে না— খোলা বাতাসই ঈশ্বরের ওষুধ।... সকালেই ওর কানটা পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। এছাড়া কিছু না।'

'একই ব্যাপার। আমার মনে হয়, ইম্যানুয়েল... আমাদের আরও সাবধানে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা উচিত। তুমি একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেবার কথা ভাব। এক দু'দিন নয়।